যুগান্তর

তারিখ • 28 • JUL • 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2

স্বচ্ছ বাক্সে অস্বচ্ছ ভোট

লিয়াকত সিন্ডিকেটের 'নীলনকশা'য় ৮ ধরনের 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। লিয়াকত সিন্ডিকেটের 'নীলনকশা' অনুযায়ী লোক দেখানো নির্বাচনের মাধ্যমে শীর্ষ দুই নেতাকে জিতিয়ে আনা হয়েছে। আর এটি বাস্তবায়ন করতে অন্তত আট ধরনের 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং' করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের।

যে আট ধরনের 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং' করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে তফসিল ঘোষণা করলেও ভোটার তালিকা প্রণয়নে অস্বচ্ছতা ও তা প্রকাশ না করা, প্রার্থীদের কাছে ভোটার তালিকা সরবরাহ না করা, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ না করা, তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা নিয়ে লুকোচুরি এবং কাউন্সিলরদের পরিচয় নিশ্চিত না হয়েই ব্যালট সরবরাহ করা। এছাড়া নির্বাচন নিয়ে ভোট কারচুপি, জাল ভোট দেয়া এবং ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্বমুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থিতা বাতিলে আহ্বান জানানোয় এটি প্রহসনের নির্বাচন পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের।

সংশ্লিষ্টদের আরও অভিযোগ, ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলনের ভোট কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য প্রার্থীদের সহাবস্থান না থাকা, বিরোধী প্যানেলের প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও ভোট প্রদান না করায় নির্বাচনে অস্বচ্ছতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লিয়াকত সিন্ডিকেটের নীলনকশা অনুযায়ী, নির্বাচনে নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন 'ডামি ক্যান্ডিডেট'। এই কৌশলের মাধ্যমে নির্বাচন যে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে— সেটি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সিন্ডিকেটের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি তাদের (সিন্ডিকেট নেতা) ধারণা ছিল একাধিক প্রার্থী থাকায় 'নীলনকশা'র বিষয়টি কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু পরে সব কৌশলই ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এ নির্বাচনকে 'পাতানো নির্বাচন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অনেক নেতাকর্মী। তাদের অভিযোগ— ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি 'লিয়াকত শিকদার সিন্ডিকেট' সদস্যদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনতেই মূলত উল্লিখিত সব অনিয়ম করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে লিয়াকত শিকদার সোমবার রাতে টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, ২০০২ সালের সম্মেলন থেকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়ে আসছে। ২০০৬ সালে দেশে প্রথমবারের মতো

ভোট : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

ছাত্রলীগের নির্বাচনের আগে লিয়াকত সিকদারের পায়ের কাছে বসা নতুন সাংগঠনিক সম্পাদক মোবারক হোসেন। পাশে সিদ্দিকী নাজমুল আলম — যুগান্তর

ভোট : স্বচ্ছ বাক্সে অস্বচ্ছ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও চতুর্থবারের মতো সারা দেশের কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শীর্ষ দুই নেতা নির্বাচিত করা হল। সবার চোখের সামনে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তাই এই প্রক্রিয়াকে যে বা যারা কালিমা লেপন করতে চান বা অকারণে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন— সেটা তাদের ব্যক্তিগত সংকীর্ণ মানসিকতা ও হীন অপপ্রয়াস। তিনি বলেন, আমি ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিলাম। শুধু আমার নয়, আমার মতো সাবেক সব কর্মীরই এই সংগঠনের সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ ছিল, আছে এবং থাকবে। যিনি যখন নেতা নির্বাচিত হন, তিনিই আমার নেতা। অন্য সাবেকদের মতোই এই সংগঠনের সঙ্গে আমার এতটুকু সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং যারা আমার নামে তথাকথিত কালিমা লেপন করছেন তারা অপবাদ দিচ্ছেন। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। সবার মনে রাখা উচিত, এই সংগঠন বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা। এই সংগঠন নিয়ে যদি কারও কোনো মতামত দেয়ার এখতিয়ার থাকে, সেটা তারই (শেখ হাসিনা) রয়েছে, আর কারও নেই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ছাত্রলীগের কাউন্সিল ও নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগের বর্তমান ও ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে হয়েছে। সেখানে আমার কোনো বাড়তি ভূমিকা ছিল না।

ছাত্রলীগের নির্বাচনে উত্থাপিত নানা অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে, জানতে চাইলে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসাইন যুগান্তরকে বলেন, ছাত্রলীগের নির্বাচন কিভাবে হল না হল, তার থেকে বড় বিষয় এটি জাতীয় নির্বাচনের এক ধরনের ধারাবাহিকতা। যখন নির্বাচন ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, তখন অন্যান্য সংগঠনেও তার প্রভাব বা প্রতিফলন দেখা যায়। যেভাবে ছাত্রলীগের নির্বাচন হয়েছে, সেটা সঠিক পন্থায় হয়নি। এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। এ ধরনের নির্বাচন হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভালো। তবে এটাও সত্য যে, অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনে ভোটই নেয়া হয় না।

ছাত্রলীগের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বারের মতো এবারও সক্রিয় ছিল লিয়াকত সিন্ডিকেট। সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে পরবর্তী নেতৃত্বে আনতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তারা। অভিযোগ ওঠে, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে আলোচিত প্রার্থীদের বাদ দিতে তাদের নির্ধারিত ২৯ বছর বয়স পার হলে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের সময় সিন্ডিকেট সমর্থিত নেতাকর্মীদের কাউন্সিলর তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণে প্রাধান্য দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। রংপুর জেলা কাউন্সিলর তালিকা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাউন্সিলর তালিকায় জেলা কমিটির মাত্র চারজন নেতা ছিলেন। বাকি ২১ জনের জেলা কমিটিতে কোনো পদ-পদবি না থাকলেও নিজস্ব বিবেচনায় কাউন্সিলর করা হয়। একই ধরনের অভিযোগ আসে দেশের বেশ কয়েকটি জেলা ইউনিট থেকে।

কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত হলে নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। 'ইলেকশন' নাকি 'সিলেকশন', বয়সসীমা ২৯ নাকি অধিক— এ দুটি বিতর্কই ছিল মতভেদের মূল কারণ। এ দুটি বিষয় নিয়ে একমত হতে পারছিলেন না সংগঠনটির সাবেক ও বর্তমান নেতারা। সূত্র জানায়, লিয়াকত শিকদার সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে 'ইলেকশন' দাবি করা হলেও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের একাংশ ও ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতাদের একাংশের দাবি ছিল 'সিলেকশন'। এ অনিশ্চয়তার মধ্যেই ২৫ জুলাই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ছাত্রলীগের অভিভাবক সংগঠন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে ছাত্রলীগের পরবর্তী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। মেধা, যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচিত এ নেতাদের বয়স অবশ্যই ২৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। ছাত্রলীগের ২৮তম জাতীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষে সংগঠনটির সাবেক নেতারা আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আলোচনায় বসেন। সেখানে লিয়াকত সিন্ডিকেটবিরোধী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রহমান, বাহাউদ্দিন নাছিম, মাহমুদ হাসান রিপনরা বয়সের বিষয়টি শিথিল করার প্রস্তাব তোলেন। তখন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ওবায়দুল কাদের জানান, বয়সসীমা ২৯-ই থাকবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে বলেও সভাকে অবহিত করেন। এতে শেষ হয় বয়স-বিতর্ক। আলোচনা শুরু হয় পরবর্তী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম নিয়ে। সভাপতি পদে সাইফুর রহমান সোহাগের বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হলেও সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে তারা একমত হতে পারছিলেন না। পরে একাধিক বৈঠক শেষে জাকির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়।

২৬ তারিখ রোববার সকাল ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। প্রথমেই প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ দেয়া হয়। এতে সভাপতি পদে চূড়ান্ত প্রার্থিতার সুযোগ পাওয়া ৬৪ জনের মধ্যে মাত্র আটজন ছাড়া সবাই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। সাধারণ সম্পাদক পদে ১৪২ জন বৈধ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৬ জন শেষ সময় পর্যন্ত প্রার্থিতা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ওজন রয়েছে, যারা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি, তারা সবাই সিন্ডিকেটেরই 'ডামি প্রার্থী' ছিলেন। এ সময় সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের অনুসারী ছাত্রলীগ নেতাদের প্রত্যেকেই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। নির্বাচন চলাকালীনও অনেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন।

প্রার্থিতা প্রত্যাহারপর্ব শেষ হলে শুধু প্রার্থী ও গণমাধ্যমকর্মী ছাড়া বাকিদের ভোট গ্রহণস্থল থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। এ সময় দেখা যায়, যারা ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের অনেকেই ভোট কেন্দ্রে অনুপস্থিত। এ ছাড়া সোহাগ ও জাকির ব্যতীত অন্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাউকে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালাতেও দেখা যায়নি। যদিও সিন্ডিকেট কর্তৃক প্যানেল ঘোষণার পর্বে তাদের পক্ষে অনেক নেতাকর্মীকে প্রকাশ্যেও প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। সে কারণে সংগঠনটির অধিকাংশ নেতাকর্মী মনে করছেন, যারা প্রার্থিতা বহাল রেখেছেন তারাও সিন্ডিকেটের নির্দেশনাতেই তা করেছেন। তাই তারা কথিত ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও প্রকাশ্যে ভোট চাওয়ার সাহস করেননি।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ভোট না চাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, অতীতে যারা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করেছেন, পরবর্তীতে ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে এবং সংগঠনের পরবর্তী কার্যক্রমে তারা ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারেননি। সে কারণে সংগঠনের শীর্ষ দুই পদ না পেলেও পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে ভালো পদ হারাতে চান না ওইসব নেতাকর্মী। তাই তারা প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। যদিও এখনও একচেটিয়া পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার আশংকামুক্ত হতে পারছেন না তারা। এছাড়া দীর্ঘ সময় সিন্ডিকেটের সঙ্গে থাকাতে 'চক্ষুলজ্জা'র কারণেও অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তাদের হাতেও চূড়ান্ত কাউন্সিলর তালিকা দেয়া হয়নি। নির্বাচন মঞ্চ থেকে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হলেও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা কাউকেই সরবরাহ করা হয়নি। নির্বাচনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী, ভোট শুরু হওয়ার আগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু নির্বাচনের আগেই নয়, নির্বাচনের পরেও কাউন্সিলর তালিকা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। পাশাপাশি প্রকাশ করা হয়নি চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকাও। এছাড়া নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হলেও ঘোষণা করা হয়নি তাদের প্রাপ্ত ভোট। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যম কর্মীরা কাউন্সিলর তালিকা, প্রার্থী তালিকা এবং নির্বাচিত ও অনির্বাচিত প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সম্পর্কে জানতে চাইলেও কোনো তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুমন কুণ্ডু শুধু নির্বাচিতদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেই স্থান ত্যাগ করেন।

ভোট গ্রহণকালে দেখা যায়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৪র্থ বর্ষের এক ছাত্র ভোট দিচ্ছেন। যিনি ছাত্রলীগের কোনো পদে নেই। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের আশরাফুল নামের এক কর্মীকে বরিশাল বিভাগের একটি জেলার কাউন্সিলর হিসেবে ভোট দিতে দেখা গেছে। মৌলভীবাজার জেলা শাখায় ২৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জন নারী কাউন্সিলরের নাম ঘোষণা করা হয়। জেলাটিতে ২৫ জন ভোট দিয়েছে ঠিকই, তবে কোনো নারী ভোটারকে ভোট দিতে দেখা যায়নি। রাজশাহী মহানগরে ২ জন নারী কাউন্সিলরের নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১ জন নারীসহ মোট ২৫ জন ভোট দেয়। বাকি ১ জন নারী ভোটারকে দেখা যায়নি। এসব ঘটনা থেকে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন নির্বাচনে ব্যাপক পরিমাণে জালিয়াতি হয়েছে।

এছাড়া ভোট যে পাতানো ছিল তার প্রমাণ মেলে সংগঠনটির নেতাকর্মীদের নির্বাচনের আগের দিনের কার্যক্রমে। রোববার ভোট গ্রহণের পূর্বেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে তারা সাইফুর রহমান সোহাগ ও জাকির হোসেনকে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিনন্দন জানান। নেতাকর্মীদের প্রশ্ন- নির্বাচনের পূর্বেই কিভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাদের অভিনন্দন জানানো হল? নির্বাচনে তাদের পরাজয়ও তো হতে পারত। অভিযোগ উঠেছে, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই দু'জনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েই তারা এ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাছাড়া ভোট প্রাপ্তির ব্যবধান কার সঙ্গে কত তা না জানানোয় এখানেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। আর মোট ৩১৩৮ ভোটের মধ্যে সভাপতি পদে সোহাগ ২৬৯০ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জাকির ২৬৭৫ ভোট পাওয়ার বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্ত সংখ্যা প্রকাশ করেনি। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সভাপতি পদে নিকটতম প্রার্থী সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য মো. তাসিম বিল্লাহ পেয়েছেন ২৭ ভোট এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি দারুস সালাম শাকিল পেয়েছেন ৫১ ভোট। ভোটের এ বিস্তর ব্যবধান পাতানো নির্বাচনের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার দুর্বলতা : ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রতিটি ব্যালটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য দুটো ঘর আছে। যেহেতু সভাপতি পদে ৮ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ১৬ জন প্রার্থী ছিল, তাই দুটি পদের জন্য আলাদা ব্যালটে ভোট দিলে গণনা প্রক্রিয়া সহজ হতো এবং স্বচ্ছতা আসত। নির্বাচন বুথে অনেক প্রার্থীই ছবি তুলেছেন। একই বুথে একাধিক ব্যক্তিকে একসঙ্গে ভোট দিতে দেখা গেছে। এতে ভোটের গোপনীয়তা নষ্ট হয়েছে এবং সিনিয়রদের দ্বারা কাউন্সিলররা প্রভাবিত হয়েছেন।

সিন্ডিকেট যেভাবে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে : সিন্ডিকেট সরাসরি ভোটদান প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে না। যেহেতু বিভিন্ন জেলা শাখায় নেতৃত্ব নির্বাচন হয় সিন্ডিকেটের পরামর্শ ও নির্দেশে। তাই কমিটিসমূহের ওপর সিন্ডিকেটের ব্যাপক প্রভাব থাকে। সাধারণত সম্মেলনের পূর্বে সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে মনোনীতদের নাম জানিয়ে দেয়া হয়। সে অনুযায়ী কাউন্সিলররা ভোট প্রদান করেন। সিন্ডিকেটের এ নিয়ন্ত্রণের কারণে নবগঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে কাজে লাগিয়ে সিন্ডিকেট পরবর্তীতে সারা দেশে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিতর্কিত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এতে করে অতীতের নানা ঘটনায় বিতর্কিত ছাত্রলীগের 'ক্লিন ইমেজে' ফিরে আসা কঠিন হবে বলে মনে করছেন তারা।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুমন কুণ্ডু বলেন, নির্বাচনে সিন্ডিকেটের কোনো প্রভাব ছিল না। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে কাউন্সিলররা প্রত্যক্ষ ভোট দিয়েছেন। সবার সামনেই ভোট গণনা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, যথাযথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট সম্পন্ন হয়েছে। প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ঘোষণা না করার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, সে সময়ে হাউস অত্যন্ত চেঁচামেচি ও কোলাহলপূর্ণ ছিল। তাই বিস্তারিত ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। তবে আমরা বিস্তারিত ফলাফল গণভবনে জমা দিয়েছি।